ইয়াসমিন রাহেলাদের পুলিশ ভেরিফিকেশন

ফারজানা মাহবুবা

বিভিন্ন চ্যানেলে আর খবরে দুর্নীতি দমন কমিশনের লম্বা বক্তব্য শুনি প্রায়ই। তাদের তোড়জোড়ে ব্যবসায়ীদের এক প্রকার ব্যবসা বন্ধ করে দেয়ার অবস্থা। কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশন করে থানা থেকে বাসায় ফেরার পথে বারবার মনে হচ্ছিল, দুর্নীতি দমন কমিশন গোড়া কেটে গাছের আগায় পানি ঢালছে না তো?

এরশাদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছিল তখন আমি খুব ছোট। বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যেতো। বড়দের ফিসফাস থেকে বুঝতাম, রাস্তায় বের হলেই পুলিশ গুলি করে দেবে। পরে বুঝেছি তখন কারফিউ চলছিল। পুলিশকে সেই প্রথম ভয় পেতে শেখা।

দিনাজপুরের ইয়াসমিনের মৃত্যুতে সে ভয় তীব্র রাগ আর ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। পৈশাচিকতার সংজ্ঞার সঙ্গে নির্মম বর্বরতা মিশিয়েছিল সেদিন বাংলাদেশের পুলিশ। ঢাকার গার্মেন্ট কর্মী ফুটফুটে গোলগাল চেহারার ইয়াসমিন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এসআই মইনুল আর কনস্টেবল আবদুস সাত্তারের পাশবিক লালসার শিকার হয় মাঝপথে। বাড়ি পৌছে দেয়ার নাম করে ইয়াসমিনকে তারা পৌছে দেয় মৃত্যুর দরজায়। ভ্যানচালকসহ তিন নরপশুর ধর্ষণের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইয়াসমিনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তারা। এখানেই শেষ না। এক শেয়াল রা দিলে যেমন সব শেয়াল যোগ দেয়, তেমনি পুলিশরাও উঠেপড়ে লাগে এ দুই পুলিশের পাশবিকতা ধামাচাপা দিতে। ইয়াসমিনকে মেরেও শান্তি দেয়নি। দু-দুবার তার লাশ তুলে ধর্ষণের সত্যতা যাচাই করা হয়। এমনকি তাকে যৌনকর্মী বলেও চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে আমাদের দেশের রক্ষকগোষ্ঠী। এখানেই শেষ নয়, ২৭ আগস্ট ইয়াসমিন হত্যার প্রতিবাদ জানাতে জড়ো হওয়া জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে সাত-সাতটি তাজা প্রাণ।

এই হলো আমাদের পুলিশ!

আরেকবার মন থেকে পুলিশকে ঘৃণা করেছিলাম ২৮ অক্টোবর।

আমি তখন ইসলামাবাদে। চিন্তা করবো, তাই আব্বু-আম্মু দেশ থেকে কিছুই জানায়নি। যথারীতি ক্লাস শেষে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়েছি কিছু টুকটাক কেনাকাটা করতে। তারপর ফাস্টফুড খেয়ে দৌড় লাগাতে হবে লাইব্রেরিতে। হঠাৎ দোকানদার চাচার প্রশ্ন, তুম তো বাংলাদেশি হো না?

আমি অবাক হয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই, আভি জলদি ইধার আও, দেখো তুমহারি দেশমে ক্যায়া হুয়া।

নিজেই দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে লাগানো বিশাল টিভির চ্যানেল চেঞ্জ করে সিএনএন দিলেন। রাস্তার পাশেই দোকান। সবাই দাড়িয়ে দেখছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ছেলেকে ঘিরে ধরে বর্বর জংলিদের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চিকন আগার কঞ্চি দিয়ে, লগি-বৈঠা দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মারা হচ্ছে। যারা মারছে তাদের পরনে ভদ্র পোশাক। অনেককেই মনে হচ্ছে, ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে। মার খাওয়া ছেলেটা টলতে টলতে উঠে দাড়াচ্ছে, আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে অর্ধমৃত ছেলেটির ওপর লাফিয়ে নাচছে ঘিরে ধরা মানুষগুলো। এবং সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, স্ক্রিনেই দেখা যাচ্ছে পুলিশের উপস্থিতি। এটা বাংলাদেশ! আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমার দেশের মানুষ এমন বর্বর নয়। হতেই পারে না। কিন্তু খবরের নিচে ব্রেকিং নিউজের পাশে যে 'বাংলাদেশ' শব্দটি জ্বলজ্বল করছে। পাশেই কোনো এক মহিলার প্রচণ্ড চিৎকারে হুশ ফিরে আসে আমার– 'স্টপ ইট! প্লিজ, সামওয়ান স্টপ ইট। ফর গডস সেইক!' মহিলা স্কুল ব্যাগ দিয়ে তার বাচ্চার চোখ ঢেকে আতঙ্কে চিৎকার করছেন। আমার মাথা ভো ভো করে ঘুরতে থাকে।

'ইয়ে ক্যায়া হুয়া বেটি? জিন্দা ইনসানকো এইসে জানোয়ারকি তারহা খুন করনেওয়ালা ইনসান নেহি হোতে! তুমহারি দেশকি পুলিশ ইতনা ডরপুক ক্যায়েসে? কুছ নেহি কররাহা হে, খাড়ি হো কার তামাশা দেখ রাহা হে!'

আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে মাথা নিচু করে ফিরে আসি ইউনিভার্সিটিতে। একটা পাকিস্তানির কাছে শেষ পর্যন্ত শুনতে হলো আমাদের দেশের পুলিশ কাওয়ার্ড!

বাসায় ফোন করি। আম্মুর শুকিয়ে যাওয়া গলা, 'জানি না, কি যে হচ্ছে দেশে! কেউ বের হচ্ছে না ভয়ে। অনেককেই ওভাবে মেরে ফেলেছে রাস্তায়।' বিকালে লাইব্রেরিতে প্যালেস্টিনিয়ান ইয়ারমেট সেহের দৌড়ে আসে। 'ফারজানা, তোমার দেশের অবস্থা তো আমার দেশ থেকেও খারাপ। প্যালেস্টাইনে ওরা আমাদের গুলি করে মারে। কারণ একজনকে পিটিয়ে মারলে ১০ জন প্যালেস্টিনিয়ান দৌড়ে আসবে। তাই ওরা গুলি করে, বোমা মারে। কিন্তু তোমার দেশে তো দেখি মানুষকে গ্রুপ বেধে খুচিয়ে খুচিয়ে মারে। ওরা কারা?'

ওরা কারা?

আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, ওরা করা?

আমার চোখে উল্লাস করতে থাকা ভার্সিটি পড়ুয়া ছেলেগুলোর চেহারা ভাসতে থাকে। ওরা আমাদেরই কেউ। শুধু কি ২৮ অক্টোবর? আরো কতো জানা, না জানা ২৮ অক্টোবর ঘটে যাচ্ছে আমাদের দেশে তার কি খবর রাখে কেউ? গার্মেন্ট কর্মী রাহেলার হত্যাকাণ্ড ২৮ অক্টোবর থেকে কম কিছু? এবং সেখানেও যথারীতি নির্বিকার আমাদের পুলিশ।

২০০৪-এ লিটন নামের এক জানোয়ার রাহেলাকে তুলে নিয়ে যায়। আরো তিনজন মিলে পাশবিকভাবে ধর্ষণ করে রাহেলাকে। শুধু এতোটুকুই নয়, ঠাণ্ডা মাথায় ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে রাহেলার শরীর। কেটে দেয় গলা। ফেলে চলে আসে জঙ্গলে। দু-তিন দিন পর আবার দেখতে যায় ফেলে আসা লাশটার কি হলো। অদ্ভুত ব্যাপার, রাহেলা তখনো মরেনি। পাশবিক নির্যাতনের পর দুদিন ধরে অর্ধমৃত পড়ে থাকা মেয়েটা নিজের হত্যাকারীদের কাছে একটু পানি খেতে চায়। পানির পরিবর্তে ওরা রাহেলার গলায় ঢেলে দেয় এসিড। পুরো শরীর পুড়িয়ে দেয় এসিডে। ওরা মানুষ, নাকি বর্বর জানোয়ার?

খুব সম্ভবত রাহেলার মৃত্যু আমার জীবনে শোনা সবচেয়ে বর্বর ঘটনা। অর্ধেক গলাকাটা সদ্য গ্যাং-রেপড মেয়েটা পড়ে থেকেছে জঙ্গলে। দুদিন পর পানি খেতে চেয়ে পেয়েছে এসিড। এতো জঘন্য ঘটনায় আসুন দেখি আমাদের পুলিশের ভূমিকা কেমন? পুলিশ কি পেরেছে মৃত্যুর সময় নিজ হত্যাকারীদের নাম বলে যাওয়া রাহেলার খুনিদের বিচার করতে?

আমি অবাক হই না। ইয়াসমিনের হত্যাকারীদের কাছে রাহেলার হত্যাকারীদের বিচার আশা করা হাস্যকর। অপরাধ যতো বড় ও যতো জঘন্যই হোক না কেন, পকেটে টাকা থাকলে এ দেশে থানা পুলিশ হাত করে ফেলা কোনো ব্যাপার নয়। ইয়াসমিন আর রাহেলাদের পুলিশ ভেরিফিকেশনের দাম এ দেশে দেড় বা দুই হাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে না, টাকার অঙ্কে তখন পিশাচদের লালসা মেটে না। ওরা তখন নির্মম মৃত্যুর দামে ইয়াসমিন, রাহেলাদের পুলিশ ভেরিফিকেশন পেপারে সাইন করে।